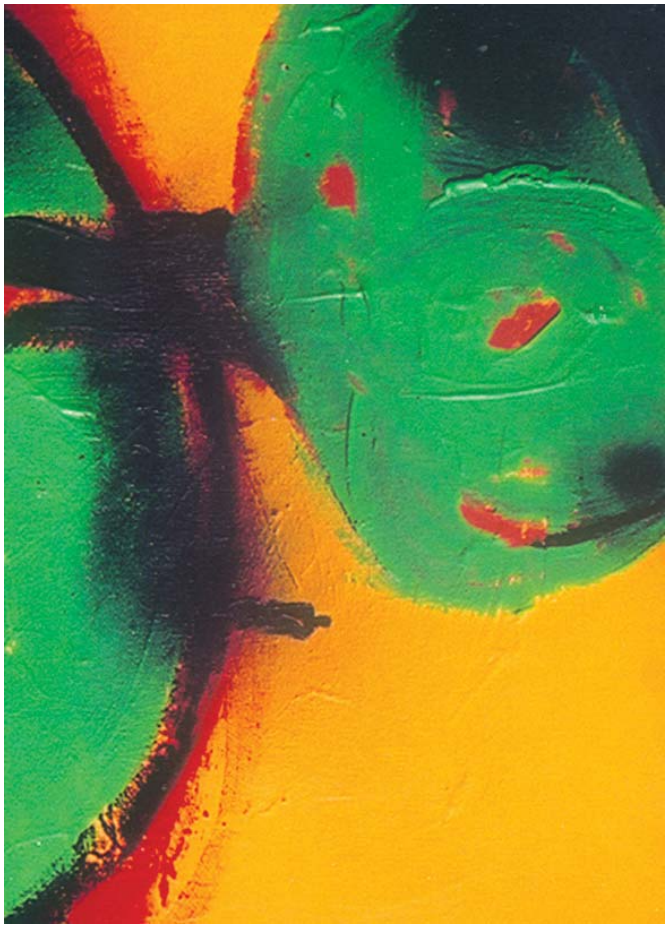

RvwKi Zvjk`vi

বহিরাগত

গ্রাম ঘোরা প্রায় শেষ। হঠাৎ-ই কুইজের মতো প্রশ্ন করে একরামউদ্দিন– এই গ্রামের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য কি খেয়াল করেছেন?

আমরা উত্তর দিতে পারি না। সদ্য দেখা গ্রাম-বসতিটিকে মনের মধ্যে উল্টে-পাল্টে দেখি। তবু উত্তর দিতে পারি না।

একরামউদ্দিন আমাদের ধাঁধায় ফেলে উজ্জ্বল হওয়ার বদলে একটু বিষণ্ন কণ্ঠেই উত্তর দেয়– এই গ্রামে কোনো ইটের বাড়ি নেই। একমাত্র ইটের দালানটি হচ্ছে গ্রামের মসজিদ।

তার একথায় উল্লাসমাখানো থাকার কথা। কেননা সে হচ্ছে এই মসজিদের ইমাম। মুয়াজ্জিনের কাজটিও তাকে প্রায় সময়ই করতে হয়। সুতরাং তার বাক্যের মধ্যে থাকার কথা প্রচ্ছন্ন গর্ব এবং আনন্দ। কিন্তু তার পরিবর্তে বিষণ্নতা আমার কানে বিসদৃশ ঠেকে।

অবশ্য একরামউদ্দিনকে প্রথম থেকেই আমার কাছে বিসদৃশ মনে হয়েছে। আমাদের পরিচয় হয়েছে আজকেই। আর আমার এই এলাকায় আসার এখনো একমাস পূর্ণ হয়নি। চকআমহাটি হাইস্কুলে মাস্টারি করতে এসে আমার থাকা-খাওয়া ঐ স্কুলের হোস্টেলেই। স্কুলের ক্লাস শেষ হয় বিকাল ৪.২০ মিনিটে। তারপরে বাকি সময়টা আমার দমচাপা মনে হওয়া স্বাভাবিক। মনে হয়ও। তাই বেশিরভাগ দিনই বেরিয়ে পড়ি। পূর্ব-পশ্চিম এবং উত্তর দিক লক্ষ্য করে। দক্ষিণদিকে বেশিদূর যাওয়া যায় না। কারণ চকআমহাটির দক্ষিণ দিকে বিলের বিস্তার। বিলের নাম হালতির বিল। আশপাশে তিন-চার মাইলের মধ্যে যতগুলি হাট আছে, সবগুলিতেই অন্তত একবার করে গেছি। পণ্যবৈচিত্র্য নেই। এক হাটে যে যে পণ্য পাওয়া যায়, অন্য হাটেও হুবহু তাই-ই মনে হয়। এমনকি মনে হয় হাটুরেরাও প্রায় সবহাটেই একই। অর্থাৎ যাকে যাকে তেলকুপির হাটে দেখেছি, তাদেরকেই মনে হয় দেখেছি ভাটুদারার হাটে। সেই লোকগুলোকেই দেখা গেছে দিয়ারভিটার হাটে। নতুন মুখ যে থাকে না, তা নয়। থাকে। ব্যাপারিরা আসে। ফড়িয়ারা। কিন্তু তারাও মনে হয় বিক্রেতাদের চেনা হয়ে গেছে দীর্ঘদিনের ব্যবসায়িক লেনদেনের কারণে। প্রত্যেক হাটেই থাকে কালো কাঠের বাক্সের ওপর সাদা রঙের দানবাক্স লেখা বেহেশতের টিকেট। কোনো হাটে দুইটি, কোনো হাটে তিনটি। কোনো কোনো মক্তব-মাদ্রাসা আবার নীরব দানবাক্সের ওপর বেশি ভরসা রাখতে পারে না। তারা হাটে ঢোকার মুখে রাস্তার ধারে একরঙা চাদর বা পলিথিন বিছিয়ে চোঙাঅলা মাইকসমেত বসিয়ে দেয় মুনসি এবং তালবেলেমদের। তারা তারস্বরে দোয়া-দরুদ পড়ে এবং বেহেশতের স্বর্ণ-রৌপ্যের ইট এবং নূরের সিমেন্টবিশিষ্ট দালান পাইয়ে দেবার গ্যারান্টি দিতে থাকে পয়সাদাতাদের। তবে বেহেশতে দালান কিনতে যে হাটুরেরা খুবই উৎসুক, এমনটি মনে হয় না। অন্তত হাট ভাঙার সময় চাদরে পড়ে থাকা টাকার পরিমাণ দেখে তাই-ই মনে হয়।

আজ বেরিয়েছিলাম উত্তরমুখো হয়ে।

আমার ঘুরে বেড়ানোর প্রধান কারণ যে সময় গড়িয়ে দেওয়া, সেটা হেডমাস্টার এখনো বুঝে উঠতে পারেননি। তিনি বরং আমাকে উৎসাহ দেন– ওয়ার্কিং ইজ দি বেস্ট এক্সারসাইজ। বিদেশে এখন সুযোগ পেলেই দলে দলে লোকে হাঁটতে বের হয়। আর আপনেরা ঢাকা শহরের মানুষ। গ্রামের মতো এত ফ্রেশ বাতাস, ফ্রেশ ওয়েদার পাবেন কোথায়?

জীবনে কোনোদিন বিদেশে পা-না-রাখা শিক্ষিত লোকেরা ঘন ঘন বিদেশের রেফারেন্স দিতে পছন্দ করে। এই ব্যাপারটা আমি আগেও খেয়াল করেছি। আর আমিও বিদেশে কোনোদিন যাইনি। তাই বিদেশের লোকেরা দলে দলে হেঁটে বেড়ায় কি না তা আমি জানি না। তবে হেডমাস্টারের পরের বাক্যের প্রতিবাদ করা যায় ইচ্ছা করলেই। কেননা আমি এখানে এসে যতটুকু দেখেছি, পরিবেশ মোটেও ফ্রেশ নয়। ডোবাগুলোতে পানিপচা গন্ধ থাকবেই। আর বাতাসে পাতলা ধুলোর স্তর প্রায় সবসময়ই ভেসে থাকে। রাস্তায় গরু-মোষের গোবর, ছাগলের নাদি-পেচ্ছাপের দুর্গন্ধ। তার সঙ্গে আশরাফুল মাখলুকাতের যাবতীয় বর্জ্যের দুর্গন্ধ এবং প্রামাণ্যচিত্র। সব মিলিয়ে গ্রামের পরিবেশকে ফ্রেশ বলা মোটামুটি সুখপাঠ্য বইয়ের পুনরুক্তি করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আজ কোনদিকে যাবেন?

হেডমাস্টরের প্রশ্নের উত্তরে আমি হেসে জানাই যে, আমার নির্দিষ্ট কোনো গন্তব্য নেই। তবে উত্তরদিক দেখিয়ে বলি যে, ঐদিকে এখনো যাওয়া হয়নি। আজ হয়তো ঐদিকেই যাব।

তিনি ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ ভেবে জানান যে, ঐদিকে দ্রষ্টব্য তেমন কিছু নেই। তবে যদি উমরপুর গ্রামে যাই তাহলে যেন তার শালীর বাড়িতে যাই। তার ভায়রা বড় ব্যবসায়ী। তাছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের পরপর দুইবার নির্বাচিত মেম্বার। কাজেই সেই গ্রামে গিয়ে তার নাম বললে যে কেউ বাড়ি দেখিয়ে দেবে।

আমি অনিচ্ছা অস্পষ্ট রেখে মাথা ঝাঁকাই। বলি– আচ্ছা।

হয়তো যেতাম উমরপুর। কিন্তু উমরপুরের আগের গ্রাম নবীনগরে আমি এমন এক দৃশ্য দেখি যে, নবীনগর পেরিয়ে আমার আর দূরে যাওয়া হয় না।

আমি যখন নবীনগরে ঢুকি, ততক্ষণে বোধহয় আছরের নামাজের জামাত শেষ হয়ে গেছে। কেননা মসজিদের বারান্দায় দেখা যায় চুপচাপ বসে আছেন দাঁড়ি-টুপি-জোব্বার টিপিক্যাল সাজে সজ্জিত একজন মানুষ। আমার দূর থেকেই ধারণা হয়, উনি ইমাম বা মুয়াজ্জিন কেউ একজন হবেন। আমি কাছে যাবার আগেই মসজিদের বারান্দায় বসে থাকা লোকটি আমাকে দেখতে পান। তিনি তাকিয়ে থাকেন একদৃষ্টিতে। আমি এই ধরনের দৃষ্টিতে ইতোমধ্যেই অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। তাই তেমন একটা গা করি না।

মসজিদের কাছে পৌঁছুতেই তার গলা ভেসে আসে– আসসালামো আলাইকুম!

আমি ওয়ালেকুম সালাম বলে তার দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাই। তখন বুঝতে পারি যে লোকটির বয়স বেশি নয়। পরিপূর্ণ যুবক। আমার চেয়ে কম বয়স।

খুব তমিজের সঙ্গে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন– ভাইসাহেব কোথায় যান?

আমি এবার অস্বস্তি বোধ করি। বিনা কারণে হাঁটছি, এই কথাটি কিভাবে নেবে লোকটা কে জানে! আমার ইতস্তভাব কাটার আগেই পরবর্তী প্রশ্ন– ভাইসাহেব কি এদিকে নতুন?

এবার আমি বলি– হ্যাঁ।

সেই সঙ্গে যোগ করি, আমি ঠিক কোন কর্মব্যপদেশে এই এলাকায় পদার্পণ করেছি।

আসেন আসেন, বসেন!

আমি একটু ইতস্তত করেও শেষ পর্যন্ত মসজিদের বারান্দায় উঠে তার পাশে বসি।

ভাইসাহেবের দেশের বাড়ি কোথায়?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমি সব সময়ই অস্বস্তিতে পড়ি। দেশের বাড়ি বলতে বোঝানো হয় গ্রামের বাড়ি বা পিতৃকুলের বসবাসের স্থায়ী জায়গা। আমার সেরকম কিছু নাই। উত্তরবঙ্গের কোনো এক লোকালয়ে একসময় বাস ছিল পিতৃপুরুষের। গত চার পুরুষ যাবৎ আমরা ঢাকাতেই থাকি। দাদার বাবা কী কারণে যেন চলে গিয়েছিলেন ঢাকায়। গ্রামের সঙ্গে সমস্ত সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে। সেই সংযোগ পরে আর পুনঃস্থাপিত হয়নি। আমার দাদা বা বাবা কেউ আর কোনোদিন গ্রামে পা রাখেনি। গ্রামের কাউকেই আমরা কোনোদিন আমাদের ঢাকার বাড়িতে আসতে দেখিনি। কাজেই ঢাকার বাড়ির এই কয়েকজন মানুষ আর ফুপুদের বিবাহসূত্রে প্রাপ্ত আত্মীয়-স্বজন ছাড়া আর কোনো আত্মীয়কেই আমরা চিনি না। তাই এই ধরনের প্রশ্নের উত্তরে আমাকে বলতে হয়– ঢাকা। আমার দেশ ঢাকা।

ঢাকার কোথায়?

শহরেই।

মৌলানা সাহেবের চোখ এবার তীক্ষ্ণ হয় একটু– ভাইসাহেব আপনেরা কি ঢাকার আদি মানুষ?

জানতে চাইছে আমরা কুট্টি কি না। আমি জানাই যে, ঢাকারই মানুষ, তবে কুট্টি না।

এরপর আমি জিজ্ঞেস করি– আপনি কি এই মসজিদের ইমাম?

ইমাম বলেন, মোয়াজ্জিন বলেন, খাদেম বলেন– আমি একাই।

তারপরেই সংশয়মাখা মন্তব্য– ঢাকার মানুষ আপনে এই গাঁয়ের ইস্কুলে চাকরি নিয়ে এলেন! ঢাকাতে কত কাজের সুযোগ! সারা দেশের লোক তো কাজের খোঁজে ঢাকাতেই যায়!